ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত রজনীর বোবা কান্না

যুথিকা বড়ুয়া

প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের দেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপগুলিতে যে মানবিক বিপর্যয় নেমে আসে, তা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু ক্রমাণ্বয়ে প্রকৃতির নিরুচ্ছাস, অস্থিতিশীলতা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। রোধ করবার সাধ্য কার! সাধারণতঃ আমরা জানি যে, ঘন কালো মেঘলাকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের একফালি উদ্ভাসিত আলোর বাঁকা ঝিলিক, গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন কিংবা বজ্রপাতই বয়ে আনে, বর্ষা ঋতুর আগমন বার্তা! সেই সঙ্গে মাতাল হাওয়ায় রাজ্যের পাতা উড়িয়ে, ছোট বড় বৃক্ষের ডালপালা দুমরে মুছড়ে, ধূলো-বালির তুফান উড়িয়ে ছুটে চলে দিগ্বিদিকে। তার পরই শুরু হয়, লাগাতার মুসলধারে বর্ষণ! আর এই অবিশ্রান্ত আকাশভাঙ্গা বর্ষণের জলে গ্রামের সমস্ত নদী-নালা-পুকুর-খাল-বিলগুলি ভরে টুবুটুবু হয়ে উপছে পড়লেই প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনায় ভয়ে আঁতঙ্কে থর্থর্ করে কাঁপতে শুরু করে রজনী! বুক ধুক্ধুক্ করে, এই বুঝি বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাস গোটা দেশ প্লাবিত করলো। এই বুঝি সুনামী নামের সেই নিষ্ঠুর, দয়া-মায়াহীন, ভয়ঙ্কও, মানুষ খেকো দস্যি রাক্ষসীটা ধেয়ে এলো।

১৯৯৭ সালের মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে এক নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছিল। যেটি প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিমর্মতায় জনগণের অগোচরে যেন এক বিশাল দৈত্যাকার ধারণ করে জলোচ্ছ্বাস আর প্রলঙ্করী ঝড়ের সম্মিলিত আক্রমনে কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম জেলার বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় ঘটিয়েছিল এক প্রলঙ্করী কান্ড! বীভৎসভাবে হতাহত হয়েছিল, দেশের হতভাগ্য দিনহীন গরীব মজদুর, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর পরিশ্রম করে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরা। ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছিল বিপুল পরিমানে! সেবার বাতাসের গতীবেগ ছিল, ঘন্টায় ১৮০ কিলোমিটার! যার ধাক্কায় প্রায় ৬-৭ ফুট জলোচ্ছ্বসে প্লাবিত হয়েছিল, ৫০ ভাগ চাষের জমি। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল উৎপন্ন ফসলের। সেদিন মা-বাবাকে চিরতরে হারিয়ে সর্বস্ব নিঃশ্ব হয়ে ছোট ছোট তিনভাই-বোন নিয়ে অনাথ রজনী আশ্রয় নিয়েছিল, মফঃস্বল অঞ্চলের নিকটস্থ এক ত্রাণ শিবিরে।

তখন ওর বয়সই বা আর কত! কৈশোরের প্রথম প্রহর! কতটুকুইবা বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছিল! তবু শরীরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে জীবনে প্রথমবার মরমে মরমে উপলব্ধি করেছিল, অপ্রাপ্ত বয়সে ছোট ভাই-বোন নিয়ে অভিভাবকহীন, সম্বলহীন, গৃহহীন, সর্বস্বান্ত হয়ে অস্বস্তি এবং বিভ্রান্তিকর পরিবেশে সুস্থ্যভাবে জীবনযাপন করা কত কঠিন!
কিন্তু রজনী তখন নিরুপায়, আত্মরক্ষার্থেই ভাইবোনদের নিয়ে ঠাশাঠাশি গাদাগাদি করে অন্যান্য শরণার্থীদের সঙ্গে ওকে কাটাতে হয়েছিল, অনিশ্চিত জীবনের অগণিত বিনিদ্র রাত। স্বামী-সন্তান, স্বজন-পরিজন নিয়ে শত শত অসহায় নিঃসম্বল মানুষ! সবাই অসমর্থ, দুর্বল! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমেই স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরে আসতে কিছুদিন সময় লাগলেও

সাময়িক বিপর্যয় ও দুর্দশা থেকে রজনী মুক্তি পেতে সক্ষম হয়েছিল, কয়েকজন সমাজহিতৈষী স্বেচ্ছাসেবকের সুপারিশে সরকারের অনুমোদিত কিছু আর্থিক সাহার্য্যে। কিন্তু কতদিন! বসে খেলে রাজার ধনও শূন্য হয়ে য়ায় দুদিনে! তারপর!
প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস ছিল রজনীর। পাড়ায় দর্জীর কাজ করতো। অর্ধাহারে থেকে বহু কষ্টে, ত্যাগ স্বীকার করে, চট্টগ্রাম জেলার শ্রীপুর গ্রামের খরন্দীপ গার্লস্ হাইস্কুল থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই খুঁজে পেয়েছিল, ওর মঞ্জিলে পৌঁছনোর সুগম পথ! দেখতে পেয়েছিল, কত না সম্ভাবনার হাতখানি! দেখেছিল, নতুন দিগন্তের নতুন আশার আলো! আর সেই আলোর পথ অনুসরণ করেই সুখ-দুঃখের ছায়ায় এগিয়ে যাচ্ছিল, নব জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে!

ভাইবোনদের প্রতিও দায়িত্ব-কর্তব্যের কোনো ত্রুটিই রাখেনি ও'! স্নেহ-ভালোবাসার ছত্রছায়ায় আবদ্ধ রেখে মা-বাবার শূন্যতাবোধ যথাসম্ভব পূরণ করবার আপ্রাণ চেষ্টায় সর্বদা রত থাকতো। কিন্তু কিশোরী বয়সে সেই প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহ মুহূর্তে মা-বাবাকে চিরতরে হারানোর শোক, দুঃখ-বেদনার যন্ত্রণা কিছুতেই সইতে পারেনা রজনী! দু'চোখ বন্ধ করলেই আজও তা দুঃস্বপ্ন হয়ে জলছবির মতো উদ্ভাসিত হয় ওর চোখের পর্দায়। আর ঠিক তখনই গত ১৫ই নভেম্বর, ২০০৭, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হিংস্র দৈত্যের মতো প্রচন্ড আক্রোশে বিরাট থাবা দিয়ে সাইক্লোন সিডরের প্রবল আঘাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপগুলির বসসবাসকারী সাধারণ মানুষের টিনের ছাউনি দেওয়া বাঁশের তৈরী বসত ভিটে-বাড়িগুলি চোখের নিমেষে ভেঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতেই ভুক্তভোগী রজনী হারিয়ে ফেলল ওর মানসিক ভারসাম্য। নিয়ন্ত্রণ ছিলনা ওর! বেহুঁশ হয়ে পড়ে। যখন হুঁশ-জ্ঞান ফিরে এলো, চোখ মেলে দেখলো, রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে গাছের ছাল-বাকল জড়িয়ে শুধুমাত্র প্রাণটা নিয়েই একটা পঁচা দুর্গন্ধ নালার মধ্য দিয়ে প্রবল স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে অতল সমুদ্রের দিকে। কোনো কিছুতে ভর করে যে ডাঙ্গায় উঠে আসবে, সে ক্ষমতাও তখন ওর ছিলনা! রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ওর কণ্ঠস্বর! আপদমস্তক জমে হীম হয়ে গিয়েছিল! কোনো অনুভূতিই ছিলনা ওর শরীরে! চতুর্দিক থেকে শুধু শুনতে পাচ্ছিল, সর্বহারা মানুষের আর্তনাদ, মরা কাঁন্না, হাহাকার, আর্তচিৎকার! বিভিন্ন এলাকা থেকে নদী নালা বেয়ে জোয়ারের টানে ভেসে আসছিল, রাজ্যের জীব-জন্তু, পশু-পাখী সহ বাচ্চা-বুড়ো-জোয়ান শত শত নর-নারীর ক্ষত-বিক্ষত বীভৎস মৃতদেহ।

কি নির্দয় ভাগ্য বিধাতা! যেখানে আলোর কণা ফুটে উঠেছিল, প্রকৃতির নির্মম ধ্বংস যজ্ঞে সেখানেই নেমে এলো রজনীর ঘোর অন্ধকার! চলার পথ নেই! এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেও নিস্তেজ নির্জীবের মতো ব্যাথাতুর শরীরটা নিয়ে অকূল দরিয়ায় ভাসতে ভাসতেই রজনী দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হয়, এবার ওর অবশিষ্ঠ কিছুই আর নেই! সব শেষ! ভাই-বোনরাও কে কোথায় যে ছিটকে গিয়েছে, কোনো হদিশ নেই কারো! হয়তো ক্ষত-বিক্ষত জনপদের ধ্বংস্তুপের মধ্যেই বেঁচে আছে কোথাও! হয়তো বা বেঁচে নেই! কে জানে!
কিন্তু রজনীতো একা নয়, সুপার সাইক্লোন সিডরের নিষ্ঠুর আঘাতে বিধ্বস্ত এলাকায় রজনীর মতো লাখো লাখো অসহায়, সম্বলহীন ক্ষতিগ্রস্থ মানুষেরা শুধুমাত্র একমুঠো

খাবারের জন্য তীর্থের কাকের মতো মরিয়া হয়ে চেয়ে আছে ত্রাণের দিকে। যদিও দুর্গতদের সহায়তার জন্য বিশ্বের প্রবাসী বাঙালিরা সহমর্মি হয়ে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে সাহার্য্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং উপদ্রুত এলাকায় সরকার ও বেসরকারি ত্রাণ তৎপরতাও শুরু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও বসত-ভিটেহীন অজস্র মানুষ খোলা আকাশের নিচে কেউ অভুক্ত, কেউ অর্ধাহারে চরম মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। আর কেউ কেউ পাগলের মতো খুঁজে চলেছে আপনজনের লাশ! তাদের পর্যাপ্ত খাবার নেই, পরনের বস্ত্র নেই, শোবার বিছানা নেই, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত নেই, ঔষধপত্র নেই! এ যে কবে পূরণ হবে, কবে যে এই দুরাবস্থার সুরাহা হবে, কবে মিটবে এই ভয়াল পরিস্থিতির পূর্ণ চাহিদা, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই!

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডা প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com